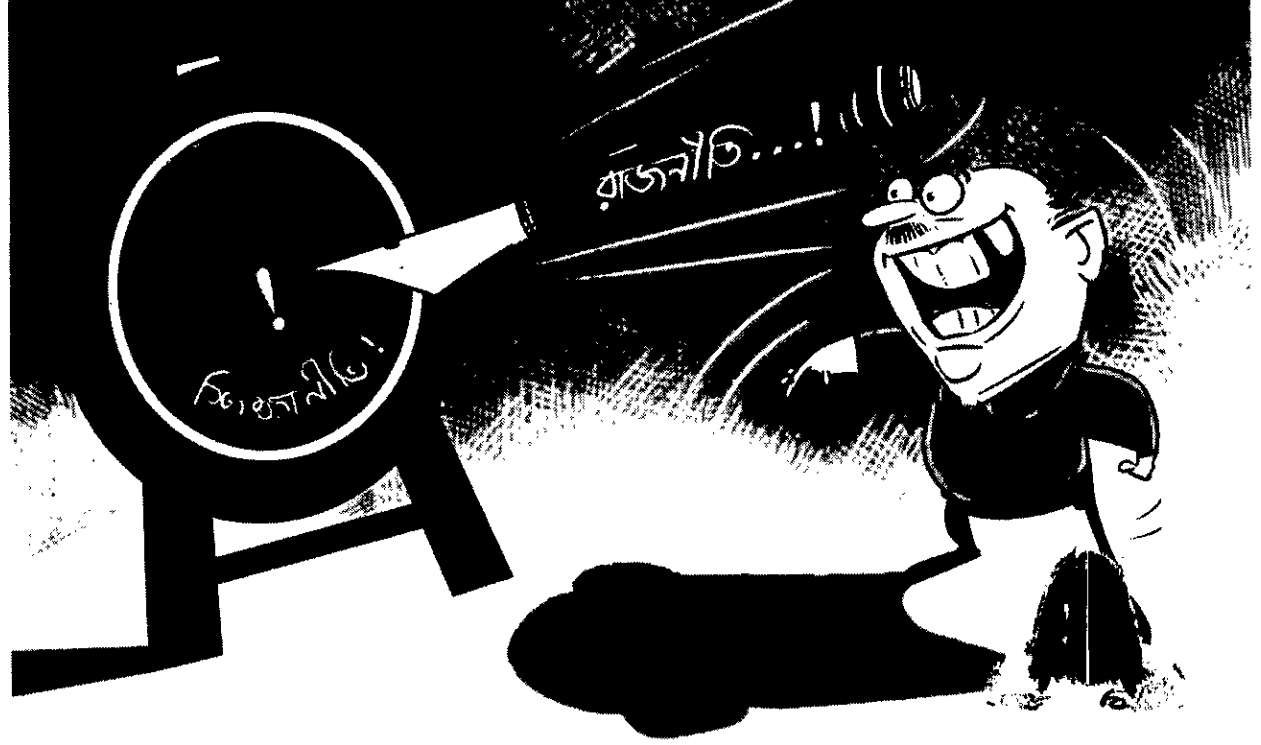
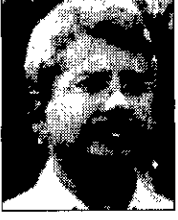


এ কে এম শাহনাজ

শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই



ফলের উৎকর্ষ দেখিয়ে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক লাভ হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আখেরে একটি কলঙ্কতিলক ঠিক কপালে ধারণ করতে হয়। আর গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হয় নৈরাজ্য। এসব বাস্তবতা সামনে রেখেই বলব, সংখ্যা দিয়ে নয়, মেধা বিচারেই শিক্ষার্থীদের এগিয়ে দিতে হবে সামনে। এ পথ পরিক্রমণে সবার আগে নীতিনির্ধারণে সরকারের লক্ষ্য স্থির হতে হবে। আর স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল হতে হবে

সম্প্রতি এক সামাজিক অনুষ্ঠানে গাজীপুর গিয়েছিলাম। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমার মতো একজন নিরীহ শিক্ষককে পেয়ে কয়েকজন চেপে ধরলেন। তাঁদের ভাষায় শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে এর উত্তর এখন আমাকে দিতে হবে। ভিন্ন রকম মনস্তাপ করলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। লেখাপড়ায় অমনোযোগী তাঁর ছেলেকে নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। টেনেটেনে এসএসসি পাস করে গেলে একটি দোকানটোকান দিয়ে দেবেন—এমন চিন্তা ছিল তাঁর। কিন্তু ফলে দেখা গেল, ছেলে তাঁর 'এ' গ্রেড পেয়েছে। এতে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক—সবাই বিস্মিত হয়েছেন। রসিক ভদ্রলোক বললেন, বাধ্য হয়ে ছেলেকে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হলো। এবার অনলাইনে ভর্তির নতুন সিদ্ধান্ত। ছেলেটি এসে পড়ল নারীছানে। বিষয়টি প্রথম বুঝতে পারিনি। কলেজসংলগ্ন এক ভদ্রলোক আমাকে পরিষ্কার করলেন। বললেন, আমাদের কলেজটি কো-এডুকেশনের। কিন্তু অনলাইনের বিড়ম্বনায় এটি গার্লস কলেজ হতে যাচ্ছে। আসনসংখ্যার ৯০ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে মেয়েদের দিয়ে। চাচার ছেলেটি এখানেই ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। একটু দূরে বসা এক অভিভাবক দম্পতি এবার যুক্ত হলেন। তাঁদের ভাষায় মনে হলো, এ দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত সব নীতিনির্ধারণ আমার হাত দিয়েই হয়। এখন জবাব আমাকেই দিতে হবে। বললেন—স্যার, কোথা থেকে পিইসি পরীক্ষা আমদানি করে আপনারা আমাদের সর্বস্বান্ত করে দিলেন। খোলাধুলা আর ছোটছোট বয়সে ছেলেকে যন্ত্র বানিয়ে ফেলছি। এই বয়সে ওকে কোচিং ক্লাসে ভর্তি করাতে হচ্ছে। শিক্ষকদের সাজেশনে গাইড বই কিনতে হচ্ছে। নিজের মতো করে ওর আর বিকাশ হবে না। পত্রিকায় দেখেছেন নিশ্চয়, ওদেরও গ্রন্থ ফাঁস হচ্ছে। নকল করার হাতেখড়ি পাচ্ছে। আমি হাতজোড় করে বললাম, মার্জনা করবেন, আমিও আপনারাই মতো একজন বিপন্ন অভিভাবক। নিশ্চয় কাগজে পড়েছেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্য ছিলেন শ্রদ্ধেয় ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষানীতিতে জেএসসি পরীক্ষার প্রস্তাব থাকলেও পিইসির কথা ছিল না। এটি পরে কোনো উর্বর চিন্তা থেকে যুক্ত হয়েছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক ছিলেন সেখানে। বললেন, দেখুন এ দেশে শিক্ষানীতি নির্ধারণে আমার মনে হয় না প্রকৃত শিক্ষাবিদ বড় ভূমিকা পালন করার সুযোগ পান। এখানে জ্ঞান বিতরণের জন্য ক্ষমতাসীল মানুষের অভাব হয় না, যারা নিজের সর্বজ্ঞানে ওণী ভাবেন। আমার একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে ২০১১ সালের। শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এনসিটিবির

মাধ্যমে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম তৈরি ও পুস্তক প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছিল। এনসিটিবির বই প্রণয়নের এ কাজে পুরনো অভিজ্ঞদের বিবেচনায় আমরা কয়েকজন কমিটির অন্তর্ভুক্ত হলাম। এরপর দেখলাম স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বই রচনার অভিজ্ঞতা নেই এমন কেউ কেউ রাজনৈতিক ও সচিব কোটায় লেখক হিসেবে যুক্ত হলেন। তাঁদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কেমন গলদঘর্ম হতে হয়েছিল আমরা জানি। সে সময় সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে প্রথম কথা ওঠে। বিষয়টি অনুভব করে প্রকল্প পরিচালনায় যুক্ত বিশেষজ্ঞদের কাছে সবিনয়ে বলেছিলাম, প্রতিটি স্কুলের শিক্ষকদের সৃজনশীল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়া এই চমৎকার চিন্তাটির বাস্তবায়ন করা ঠিক হবে না। তারা আশ্বস্ত করেছিলেন, প্রতি জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। হয়তো হয়েছিলও। কিন্তু তা দিয়ে কি প্রতিটি স্কুলের শিক্ষকদের সমৃদ্ধ করা গেছে? শেষ পর্যন্ত ফল যা হওয়ার তাই হলো। এত বছর পরও সৃজনশীলে সংকট রয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, এতে করে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি হবে এবং গাইড-নোট পড়ার প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু ফলে দেখা গেল সাধারণ গাইড বইয়ের সঙ্গে এবার যুক্ত হলো সৃজনশীলের গাইড বই। অভিভাবকদের ছুঁতে হলো কোচিং সেন্টারে। যোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার এসব পরীক্ষা আর কত চালাব আমরা! শিক্ষা নিয়ে মনটিরিং নেই কোথাও। ছোট ছোট শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে একগাদা বই। আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো বিভিন্ন স্কুল চাপিয়ে দিচ্ছে আরো কিছু বই। এর কতটা প্রয়োজন আর কতটা বাগিঁজা—বোঝা মুশকিল। কিন্তু চিড়েচাপটা হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থী আর তাঁদের অভিভাবক। এসব নজরদারি করবে কে? স্কুল আর কলেজগুলোতে শিক্ষকরা কি নীতি আর আদর্শের বিচারে ক্লাসরুমে দায়িত্ব পালন করছেন? এখানে আবার রকমফের আছে। মেধাবী ফল করা গ্রাজুয়েটদের বেতন কাঠামো বিচারে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতায় আসার আগ্রহ থাকার কথা নয়। একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এর চেয়ে রিকশা চালালে সংসার সম্ভবত একটু ভালো চলত। দু-একটি টিউশনি করে কয়েকশে তবু চলছে। এখন নাকি প্রাইভেট পড়ানোর বিরুদ্ধে আইন হচ্ছে। বিষয়টি খারাপ না, তবে আমরা বাঁচব কিভাবে? আবার শহরের আরেকটি চিত্র আছে। ঢাকা শহরে মেয়েদের একটি নামি স্কুলের কথা বলছি। সেখানে আমার নোজানা বেশ কয়েকটি পরিবারের সন্তানরা পড়ছে বা পড়ছে। প্রত্যেকেরই অভিমত অভিন্ন। তাঁদের বিচারে স্কুলটা সাইনবোর্ড মাত্র। পড়াশোনা স্কুলে হচ্ছে না।

আমরা প্রত্যেকে বাধ্য একাধিক বিষয়ে এই স্কুলেরই শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়তে। ফলটা আসে এই পথ ধরেই। এসব অভিযোগের আংশিক সত্য হলেও অবস্থার মারাত্মক। সম্প্রতি জানা গেল, কোচিং ব্যবসা আর গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। আমার কাছে বিষয়টি নতুন কিছু মনে হয়নি। আইন কী ছিল, না ছিল জানি না। তবে নোট বইয়ের বিরুদ্ধে নীতিনির্ধারণ করা হয়েছিল অনেক আগেই। তখন নোট বই রাতারাতি গাইড বই নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়টি যে কারো কাছে স্পষ্ট ছিল না তা নয়। কিন্তু গাইড বই তো সদস্ত প্রকাশ্যে বইয়ের বাজারে জায়গা করে নিয়েছে। একে প্রতিহত করার ব্যবস্থা কোনো পক্ষ গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। শুধু স্কুল নয়, অভিযোগ আছে, কলেজের অনেক শিক্ষকও নাকি গাইড বই নির্ভর করে ক্লাসে যান। ক্লাসগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নগণ্য থাকে। নৈতিকতা ও পাশপাশি দায়বদ্ধতা না থাকলে কিভাবে এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে! স্কুল-কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের তৈরি করার দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত ও জীবিকার জায়গাটিকে যৌক্তিক অবস্থায় না নেওয়া পর্যন্ত কোচিং বাগিঁজা বন্ধ করা কি সম্ভব? হয়তো ব্যবসায়ের নাম পরিবর্তন হবে বারবার। অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষা গতানুগতিকতা পরিহার না করতে পারলে আইন করে ভর্তি কোচিং বন্ধ করা সম্ভব, তেমন বিশ্বাস আমার নেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তো নষ্ট করা হয়েছে আরেকভাবে। নৈতিক বোধে তাড়িত অনেক শিক্ষক এখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আছেন। নিজেদের সাধ্যমতো পাঠদান ও গবেষণা করে যাচ্ছেন। কিন্তু নষ্ট পরিবেশ তৈরির পরিস্থিতিও কম নয়। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কু-রাজনীতির প্রভাব এই জায়গাটি নষ্ট করে দিচ্ছে। আর এসবের প্রয়োজক রাষ্ট্রক্ষমতার পেছনে ছোট রাজনৈতিক নেতৃত্ব। যদিও সুযোগ পেলে সরকারি দলের নেতা-নেত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে বক্তৃতা বলেন, কিন্তু মানতে হবে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে সব সময়ের সরকারি পক্ষই। এখন অনেকটা নিয়ম হয়ে গেছে, সরকারপক্ষের ছাত্রসংগঠন ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়াবে। মুক্তচিন্তার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধার্চা-সংস্কৃতিচর্চাকে ব্যাধগ্রস্ত করবে। দুর্বৃত্ত আচরণে রক্তাক্ত করবে ক্যাম্পাস। আর বাকি পরিবেশ নষ্ট করবে দলীয় শিক্ষক রাজনীতি। মেধা ও পাণ্ডিত্য বিচারে নয়, এখন সরকারি রাজনৈতিক বিবেচনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হলেও সেখানে অন্তরালে

সরকারি কুৎকৌশলই কাজ করে। ফলে উপাচার্যকে ঘিরে একটি রাজনৈতিক শিক্ষক দল বেড়ে ওঠে। দলের শক্তি বাড়তে মেধা বিচারের বদলে দলের পরিচয়ে পেছনের সারি থেকে শিক্ষক নিয়োগ হতে থাকেন। এভাবে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পাসের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই এ দায় কখনো রাজনৈতিক দলগুলো স্বীকার করে না। নিবেদিত শিক্ষকরা লাঞ্চিত হন অবাচীন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কটু শব্দবাণে। শিক্ষা নিয়ে নীতিনির্ধারণের সব সময়ই বড় বড় নীতিবাক্য শোনান—বাগাড়ম্বর করেন। কিন্তু শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কি স্থির করেছেন? সরকারি কার্যালয়ে কি তেমন স্বচ্ছতা রয়েছে? পিইসি, জেএসসি, এসএসসি পরীক্ষার অত্রাভেদী স্বর্ণমোড়ানো ফল ঘোষণা করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরার সামনে উজ্জ্বল প্রকাশ করেন। দেখে আমরা বিব্রত হই। আমার মনে হয় না বাংলাদেশের মতো আর কোনো দেশে এমন অনেকটা আরোপিত ফল তৈরি করে উজ্জ্বলিত হওয়া যায়। আমি প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ক্ষমা চেয়েই বলব, এসব রাজনৈতিক বাহবার বাইরে শিক্ষার মান বাড়ানোর কোনো চেষ্টা কি করা হয়েছে? স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা—সবাই জানেন আজকাল কিভাবে পাসের হার বাড়ানোর জিপিএ ৫ ও স্বর্ণমোড়ানো ফলাফলের এত ছড়াছড়ি কেন! আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াই তাঁরা প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষায় গিনিপিগ দুর্ভাগা ছাত্রছাত্রীদের দশা দেখি। ভর্তির পর তাদের বড় সংখ্যকের অধীত বিদ্যার অবস্থা দেখে বিষম হই। এভাবে ফলের উৎকর্ষ দেখিয়ে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক লাভ হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আখেরে একটি কলঙ্কতিলক ঠিক কপালে ধারণ করতে হয়। আর গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হয় নৈরাজ্য। এসব বাস্তবতা সামনে রেখেই বলব, সংখ্যা দিয়ে নয়, মেধা বিচারেই শিক্ষার্থীদের এগিয়ে দিতে হবে সামনে। এ পথ পরিক্রমণে সবার আগে নীতিনির্ধারণে সরকারের লক্ষ্য স্থির হতে হবে। আর স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল হতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রতি মানবিকও হতে হবে। শিক্ষা আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যদি আমাদের ক্ষমতাসীল রাজনীতি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না চাইত তবে শিক্ষা-উন্নয়নে একটি যৌক্তিক লক্ষ্য স্থির করা ও এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়